গত শতকের শেষের দিকে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের ওপরে ওজোনস্তরে বিশাল এক গহ্বর তৈরির দুঃসংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৬ মে ১৯৮৫ সালে প্রভাবশালী বিজ্ঞান জার্নাল ‘নেচার’ সেই দুঃসংবাদ প্রকাশ করার পর টনক নড়ে উঠেছিল বিশ্বের সংশ্লিষ্ট মহলের। ত্বরান্বিত হয়েছিল ওজোনস্তর রক্ষার জন্য ঐতিহাসিক মন্ট্রিয়ল চুক্তি। আর এই চুক্তির ফলে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী ক্লোরোফ্লোরোকার্বন (সিএফসি) তৈরি, নিয়ন্ত্রণ কিংবা বন্ধ করা সম্ভব হয়েছিল। ফলে অ্যান্টার্কটিকার উপরিস্থিত ওজোনস্তরে বিশাল গহ্বরের আয়তন কমে আসছিল। নাসা ও জাতিসংঘ থেকে ধারণা করা হচ্ছিল যে আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই উল্লিখিত গহ্বরের আয়তন তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমে এসে তা ক্ষতিকর পর্যায়ের নিচে চলে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ৩৩ বছর পরে ১৬ মে ২০১৮ ওজোনস্তর সম্পর্কিত নতুন দুঃসংবাদ আবার সেই ‘নেচারে’ প্রকাশিত হয়েছে। ড. মনাস্কাসহ মোট ১৭ জন বিজ্ঞানীর লেখা সেই প্রবন্ধে বলা হয়েছে—১. ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যগুলো তৈরির ওপর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সিএফসি-১১ উৎপাদনের পরিমাণ সাম্প্রতিককালে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ২০ বছর আগে যে পরিমাণ সিএফসি-১১ নিঃসরণ হতো আজও সেই পরিমাণ সিএফসি-১১ নিঃসরণ হচ্ছে। অন্যান্য ক্ষতিকর গ্যাসের নিঃসরণও হ্রাস পায়নি। ২. এই গ্যাস নিঃসরণের জন্য নির্দিষ্টভাবে কোনো দেশকে চিহ্নিত করা না গেলেও পূর্ব এশিয়া থেকে তা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ৩. গবেষণার এই ফলাফল নতুনভাবে সিএফসি গ্যাস তৈরির ইঙ্গিত দিচ্ছে, যা মন্ট্রিয়ল প্রটোকলের সিএফসি গ্যাস তৈরি বন্ধ করার সিদ্ধান্তের সঙ্গে বেমানান। উল্লেখ্য, সাড়া জাগানো এই প্রবন্ধের লেখকেরা মন্ট্রিয়ল প্রটোকলের বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন প্যানেলের সদস্য। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁরা কাজ করেন।

এই প্রবন্ধ প্রকাশের আগে ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ইউরোপিয়ান জিওসায়েন্স ইউনিয়নের একটি জার্নালে (অ্যাটমসফেরিক কেমিস্ট্রি অ্যান্ড ফিজিকস) প্রকাশিত প্রবন্ধেও ওজোনস্তর সম্পর্কে দুঃসংবাদ দেওয়া হয়েছিল। এই প্রবন্ধটিও ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ জন বিজ্ঞানীর যৌথভাবে লেখা। এই প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রবন্ধটির একজন লেখক ইম্পেরিয়াল কলেজ, লন্ডনের প্রফেসর ড. হেগ নিউ ইয়র্কভিত্তিক ‘সায়েন্স ফ্রাইডে’র সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘বিষুবরেখার কাছে ও মধ্য অক্ষাংশের ভেতরে ওজোনস্তরের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল নয়।’ ১৯৯৮ সাল থেকেই মেরু অঞ্চলের বাইরেও বিষুবরেখার ৬০ ডিগ্রি উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলজুড়ে ওজোনস্তরের নিচের দিকে ক্রমাগতভাবে পাতলা হচ্ছে বলে সেই গবেষণায় দাবি করা হয়েছে। গবেষণাপত্রে যদিও ওজোন কলামের গড় দৈর্ঘ্য তাৎপর্যপূর্ণভাবে এখনো না কমার কথা বলা হয়েছে, তবু এই ফলাফল নিঃসন্দেহে নতুন আরেক দুঃসংবাদ। এতদিন পর্যন্ত ওজোনস্তর ক্ষয়ের সংবাদ মূলত অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের ওপরেই সীমাবদ্ধ ছিল। গবেষণার ফলাফল সত্যি হলে সুমেরুবৃত্তের দক্ষিণে বাংলাদেশসহ প্রায় গোটা উত্তর গোলার্ধে ও অ্যান্টার্কটিকা ছাড়াও গোটা দক্ষিণ গোলার্ধে ভবিষ্যতে ওজোনস্তর ক্ষয়জনিত অভিঘাত দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকছে।

জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি ড. মনাস্কাদের গবেষণা ফলাফলকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে প্রবন্ধটি প্রকাশের দিনেই অর্থাৎ ১৬ মে ২০১৮ বিবৃতি দিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘চলতি শতকের মাঝামাঝি প্রত্যাশামাফিক ওজোনস্তর যখন ঠিক হওয়ার পথে তখন ক্রমবর্ধমান সিএফসি-১১ নিঃসরণ ওজোনস্তর ঠিক হওয়ার পথকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। মন্ট্রিয়ল প্রটোকলের বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন প্যানেলের সদস্য—যাঁরা আবার এই প্রবন্ধের লেখক, তাঁরা এ বছরের মধ্যে চুক্তির চতুর্থ বার্ষিক মূল্যায়ন করবেন।

জাতিসংঘের ওজোন সেক্রেটারিয়েট ২৬ জুলাই ২০১৮ একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। বিজ্ঞপ্তিতে ২০১২ থেকে সিএফসি-১১ নিঃসরণ বৃদ্ধি পাওয়া, পূর্ব এশিয়া থেকে এই গ্যাস নিঃসরণ হওয়া ও ২০১০ সাল থেকে বন্ধ হওয়া সিএফসি-১১ অগোচরীভূত অবস্থায় আবার তৈরি হওয়ার বিষয়ে ‘নেচার’ প্রকাশিত ফলাফলের সঙ্গে একমত হয়ে এগুলো মন্ট্রিয়ল প্রটোকলভুক্ত দেশগুলোর আসন্ন ৩০তম সভায় (৫-৯ নভেম্বর ২০১৮, ইকুয়েডর) উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই সঙ্গে সিএফসি-১১ নিঃসরণের নির্দিষ্ট উৎস চিহ্নিতকরণের বিষয়টিও বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ওজোনস্তরের এ রকম দুঃসংবাদ-উত্তর পরিস্থিতির মধ্যে এবারের আন্তর্জাতিক ওজোনস্তর রক্ষা দিবস ২০১৮ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবারের এই দিবসের ইংরেজি প্রতিপাদ্যের (কিপ কুল অ্যান্ড ক্যারি অন) বাংলা ভাবানুবাদ করলে দাঁড়ায়, ‘বিশ্বকে ঠান্ডা রাখো ও এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকুক।’ আসলে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী অনেক রাসায়নিক

বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্যও দায়ী। কাজেই ওজোনস্তর রক্ষার কর্মকা- বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাসের ব্যাপারেও সাহায্য করবে। এ ছাড়া 'সিএফসি' ও 'এইচসিএফসি'র বিকল্প হিসেবে শিল্প-কারখানায় বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত 'এইচএফসি' (হাইড্রোফ্লুরোকার্বন) ওজোনস্তরের জন্য ক্ষতিকারক না হলেও তা কার্বন ডাই-অক্সাইডের থেকে প্রায় হাজার গুণ শক্তিশালী ও অনেক বেশি বৈশ্বিক উষ্ণতা সৃষ্টির জন্য দায়ী। বলা হচ্ছে যে এইচএফসি কমাতে পারলে বিশ্বের তাপমাত্রা ০.৫ ডিগ্রি কমে আসবে। আর সে কারণেই এবারের আন্তর্জাতিক ওজোন দিবসের প্রতিপাদ্যে ওজোনস্তর রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির বিষয় সম্পর্কেও সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে।

তবে এবারের এই দিবসে সংশ্লিষ্ট সবার মনে রাখা প্রয়োজন যে বর্তমান প্রযুক্তির যুগে ওজোনস্তর তথা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর যা কিছু করি না কেন, তা গোপন থাকবে না। আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করার পরে কোনো দেশ সেই চুক্তির শর্ত না মানলে তাকে অবশ্যই অন্যায় হিসেবে দেখা হবে। মন্ট্রিয়ল প্রটোকলভুক্ত ১৯৭টি দেশের আসন্ন ৩০তম সভায় নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে আলোচনা হবে। ওজোনস্তর ধ্বংসকারী বস্তুর উৎপাদন উৎস নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিতকরণ ও সেই মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্তও প্রত্যাশা করা যায়।

বাংলাদেশ ওজোনস্তর রক্ষায় ভিয়েনা কনভেনশন, মন্ট্রিয়ল প্রটোকল ও এ পর্যন্ত চারটি সংশোধনীতে (লন্ডন, কোপেনহেগেন, মন্ট্রিয়ল ও বেইজিং) স্বাক্ষর করেছে। তবে ২০১৬ সালে রুয়ান্ডার রাজধানী কিগালি সম্মেলনে মন্ট্রিয়ল প্রটোকলে তালিকাভুক্ত রাসায়নিকের সঙ্গে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিকারক হাইড্রোফ্লুরোকার্বনকে (এইচএফসি) সংযুক্ত করে তৈরি করা 'কিগালি সংশোধনী'তে এখনো স্বাক্ষর করেনি। জানা গেছে সে বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

ওজোনস্তর রক্ষায় বাংলাদেশ এ পর্যন্ত জাতীয় ওজোন ইউনিট গঠন, ওজোনস্তর ক্ষয়কারী বস্তুর উৎপাদন, ব্যবহার, আমদানি ও রপ্তানি বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিমালা প্রণয়ন ও সংশোধনসহ অনেক কাজেই সন্তোষজনক সাফল্য লাভ করেছে। প্রযুক্তিগত কিছু প্রশিক্ষণ কাজও সম্পন্ন হয়েছে। বহুপক্ষীয় তহবিল থেকে বাংলাদেশ ১১.৭৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার অনুমোদন পেয়েছে, তবে বাংলাদেশের জন্য এখন অন্যতম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এইচএফসি প্রতিস্থাপন। বাংলাদেশে রেফ্রিজারেটর, এয়ারকুলার, (ভবন বা মার্কেটে সেন্ট্রাল সিস্টেমসহ) গাড়ি ও ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে বিপুল পরিমাণ এইচএফসি ব্যবহৃত হয়েছে ও হচ্ছে। বিশেষ করে আমদানীকৃত গাড়ি ও ইনহেলারে এইচএফসি প্রতিস্থাপন বাংলাদেশের জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। এ ছাড়া এইচএফসির বিকল্প যে ডজনখানেক রাসায়নিক বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে তার প্রতিটি কমবেশি দাহ্য। এ ধরনের দাহ্য রাসায়নিক ব্যবহার উপযোগী করার জন্য যে অবকাঠামো ও প্রযুক্তি প্রয়োজন, তা বাংলাদেশের নেই। সেটিও আরেকটি চ্যালেঞ্জ। মাঠপর্যায়ে মনিটরিংয়ের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত জনবল প্রয়োজন। আশা করা যায়, এই চ্যালেঞ্জগুলো বাংলাদেশ সময়মতো সঠিকভাবে মোকাবেলা করে ওজোনস্তর রক্ষা ও বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সক্ষমতার পরিচয় তুলে ধরবে। এ প্রসঙ্গে পরিবেশ অধিদপ্তরের অধীন ওজোন ইউনিটের কাছে একটি অনুরোধ থাকবে যে ওজোনস্তর রক্ষাসংক্রান্ত বাংলাদেশে সমাপ্তকৃত, চলমান এবং ভবিষ্যৎ কর্মকা- সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য ও পরিসংখ্যানসহ (ওজোনস্তর রক্ষাসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক প্রধান কর্মকা-ের লিংকসহ) একটি ওয়েবসাইট চালু করা।

লেখক : অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়